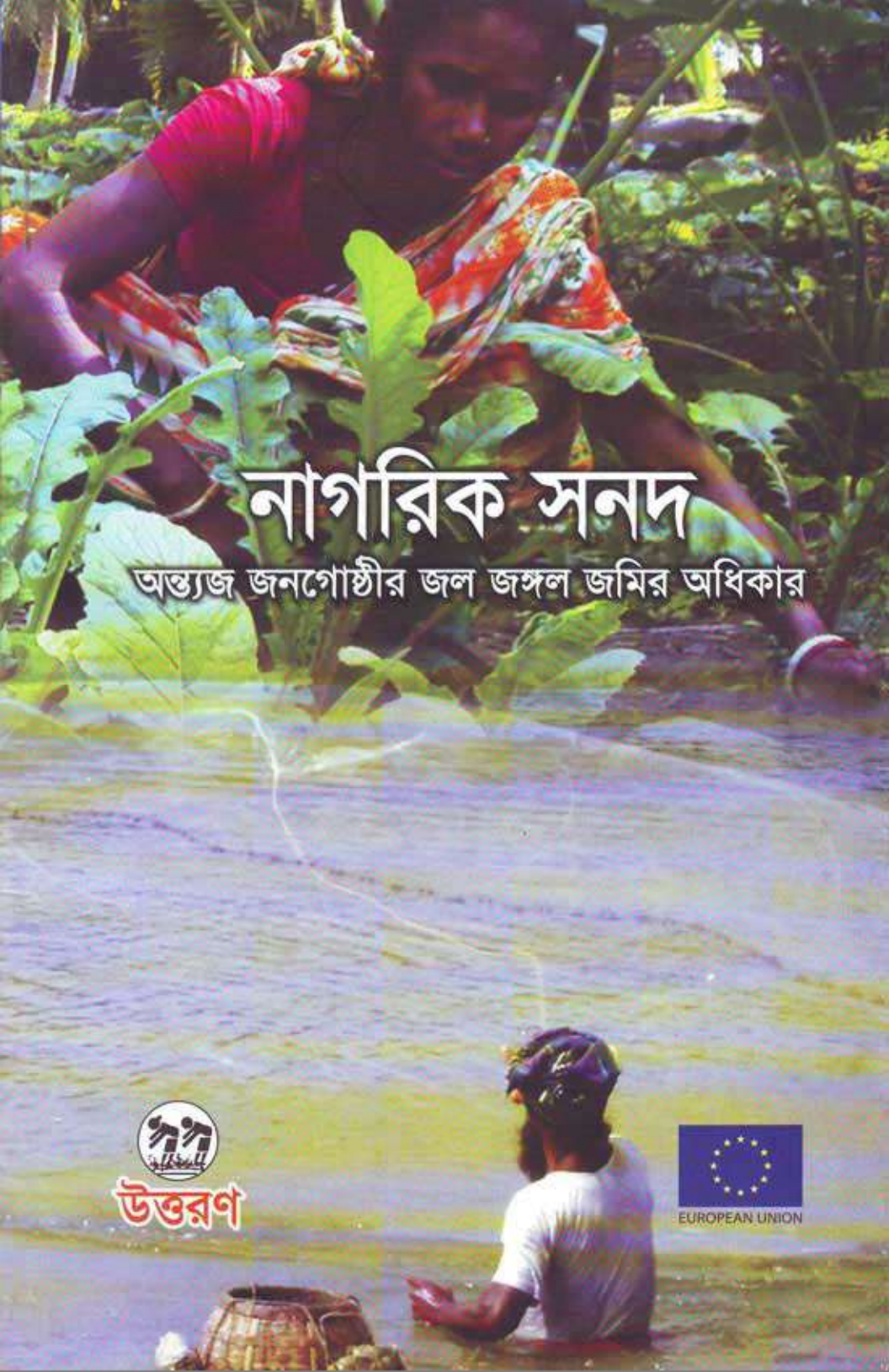
নাগরিক সনদ
অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর জল জঙ্গল জমির অধিকার
উত্তরণ
EUROPEAN UNION

# নাগরিক সনদ
## অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর জল জঙ্গল জমির অধিকার

নির্দেশনায়
শহিদুল ইসলাম

সম্পাদনায়
সাব্বির বিন শামস্

কৃতজ্ঞতায়
গৌরাঙ্গ নন্দী

প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০১১

ডিজাইন ঃ অংকুর
৪৪ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা। ৮১৩৮৬০

প্রিন্টিং ঃ প্রচারণী প্রিন্টিং প্রেস
৪৪ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা। ৮১০৯৫৭

উত্তরণ

ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন

# আমাদের কথা

মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে এই ভূখন্ডের জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তির যে স্বপ্ন দেখেছিল, তা আজও অর্জিত হয়নি। স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে আমরা অনেক ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেছি, পাশাপাশি অনেক কিছুই অর্জন করতে সক্ষম হইনি। তেমনি একটি ক্ষেত্র হচ্ছে, সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাতহীন একটি সমাজ গড়ে তোলা। যে সমাজে সকলের পরিচয় হবে আমরা মানুষ, মানুষই তাঁর একমাত্র পরিচয়। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের সমাজে এখনও অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ বলে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে খুবই অবজ্ঞা করা হয়; সমাজের মূলধারায় আজও এঁরা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সমাজের এক শ্রেণীর মানুষেরা তাদেরকে খুবই হেয় চোখে দেখে। তাঁরা আজও সকল জায়গায় সহজভাবে চলাফেরা করতে পারেনা, অনেক মানুষ তাঁদেরকে দূর দূর করে, ছোট-জাত বলে অবজ্ঞা-উপেক্ষা করে। তাঁরা জীবন-জীবিকার জন্যে খুবই কষ্টকর সংগ্রাম করে। এখনও তাঁদের জন্যে সমাজের সকল সুযোগ-সুবিধা উন্মুক্ত নয়।

উত্তরণ বরাবরই এই অন্ত্যজ গোষ্ঠীর মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা সমাজের মূলধারায় নিয়ে আসার জন্যে চেষ্টা করে চলেছে। উত্তরণ চায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসরত রিশি, কাওড়া, ভগবেনে, কায়পুত্র, বাজনদার, রাজবংশী প্রভৃতি পরিচয়ের মানুষেরা সমাজের মূলধারায় মিশে যাক। ঘুচে যাক তাঁদের অন্ত্যজ পরিচয়। সমাজে মানুষ হিসেবে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হোক। নাগরিক হিসেবে 'অন্ত্যজ' পরিচয়ের এই জনগোষ্ঠীর অধিকার কি, আমরা তাই সকলেরর মাঝে 'নাগরিক সনদ' নামে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। নাগরিক হিসেবে ওই গোষ্ঠীর মানুষেরা তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারলে আমাদের এই চেষ্টা সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

সমাজ থেকে 'অন্ত্যজ' পরিচয় দূর হোক।

**শহিদুল ইসলাম**
পরিচালক
উত্তরণ

# প্রেক্ষাপট

**"... বেশীরভাগ হিন্দু এবং মুসলিম নিম্ন বর্ণের (দলিত) সম্প্রদায়ের লোকেরা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার। জীবন ধারণের অপরিহার্য সুযোগ-সুবিধায় তাদের প্রবেশাধিকার খুবই সীমিত এবং বৈষম্যকৃত।"**

ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ দলিত স্টাডিজ (২০০৯) কাস্ট বেজড ডিসক্রিমিনেশন ইন সাউথ এশিয়া: এ স্টাডি অফ বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ৫১।

বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি, হিন্দু ও বৌদ্ধ ইতিহাস- ঐতিহ্য এবং পরবর্তিতে মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক যে আচার-প্রথা প্রবাহমান তা এই ধর্মগুলোর বিভিন্ন অনুশীলন থেকে এসেছে। যাতে ধর্মীয় সামাজিক ব্যবস্থায় ক্রমোচ্চতাভিত্তিক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত। হিন্দু ধর্মে যা বর্ণ প্রথা হিসেবে স্বীকৃত। উচ্চ বর্ণ, মধ্য বর্ণ এবং নিম্ন বর্ণ হিসেবে এই বিভাজন দেখা যায়। এতে পেশাগত পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। অর্থাৎ পেশার ধরণে সামাজিক বৈষম্য দেখা যায়। যেমন হিন্দু নিম্ন বর্ণের হিসেবে চিহ্নিত কাইপুত্র বা কেওয়া সম্প্রদায়ের প্রধান পেশা হচ্ছে শুকর পালন আর এ কারণে তারা সমাজের অন্যান্যদের কাছে অচ্ছ্যুৎ। একইভাবে হিন্দু নিম্নবর্ণের রাজবংশী, মুচি, কর্মকার, জেলে যারা তাদের পেশাগত ধরনে নিম্ন বর্ণের পরিচয় বহন করে। এবং এরা সমাজের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। তাদের বসবাসের স্থানও পৃথক-সাধারণত: অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বা বস্তিতে। এরা নিম্নবর্ণ[দলিত] হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এই নিম্ন সম্প্রদায় "অশূচী" হিসেবে এবং উচ্চ বর্ণ শূচী হিসেবে পরিগণিত। যাতে অশূচী নিম্ন বর্ণ সূচী উচ্চ বর্ণের থেকে পৃথক স্থানে তাদের সমপর্যায়ের প্রতিবেশীদের সাথে বসবাস করবে। মুসলিম ধর্মে বর্ণপ্রথা স্বীকৃত নয় বলে বলা হলেও সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতায় মুসলমান ধর্মেও বর্ণ প্রথা দেখা যায়। উপমহাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রসার মূলত: আরব, আফগান, পার্সিয়ান ইসলামী ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে। ফলে এ অঞ্চলের বিশাল হিন্দু নিম্ন বর্ণের মানুষ তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় বৈষম্য থেকে মুক্তির আশায় ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু আরব, আফগান, পার্সিয়ান মুসলমান ছাড়াও বাঙালী মুসলমানের চারটি প্রধান গোষ্ঠীতে চিহ্নিত হতো-সৈয়দ, মুঘল, শেখ এবং পাঠান বা খান। এদের বিপরীতে এই নিম্নবর্ণের হিন্দু ধর্মান্তরিত মুসলমানরা একভাবে নিম্নবর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

যাতে উচ্চ বর্ণ আশরাফের বিপরীতে ক্রমোচ্চতায় আতরাফ, আজরাফ ইত্যাদি নিম্ন বর্ণ নির্ধারিত হয়। যাতে একজন আরবের তুলনায় একজন অ-আরব মুসলমান তুলনামূলকভাবে নিম্নবর্ণের। যদিও মুসলমানদের এই বর্ণপ্রথা হিন্দু বর্ণপ্রথার মতো একইরকম নয়। এবং এখানেও পেশা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্ম পরিবর্তন করলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আগের পেশায়ই থেকে গেলে এখানেও জেলে, ধোপা প্রভৃতি পেশার লোকেরা নিম্ন বর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে। এবং একইভাবে এরাও সমাজের মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং পৃথক স্থানে বসবাস করে।

সামাজিক কারণেই হোক বা জীবিকার কারণেই হোক এই অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর বসবাস প্রকৃতির খুব কাছাকাছি। তারা তাদের জীবন ধারণের অপরিহার্য উপাদানগুলো সরাসরি প্রকৃতি থেকে আহরণ করে। কিন্তু প্রকৃতির সাথে প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর রয়েছে আত্মিক বা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। এই সম্পর্ক প্রকৃতিকে লালন করে সহনশীলতার মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন মেটানোর। ফলে যুগ যুগ ধরে ভূমি, বন, সমুদ্র, পাহাড়, জলাভূমির সাথে অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক নিবিড়। তাদের বিশ্বাস, ধর্ম, আচার, সংস্কৃতি, নিজস্ব প্রথাগত আইন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে। বর্তমান বা আধুনিক অনেক ব্যবস্থার সাথেই তাদের জীবন ব্যবস্থায় রয়েছে নানাবিধ পার্থক্য; স্বাতন্ত্র্য। এবং আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, আইন-আদালত, ব্যক্তি সম্পত্তি কিংবা ভাগ-বাটোয়ারার বিষয়গুলো বেশীরভাগক্ষেত্রেই তাদের শতাব্দী বা তারো অধিক প্রাচীন থেকে চলে আসা জীবন ব্যবস্থা, রীতি-নীতির সাথে দ্বন্দ্ব তৈরী করছে। যার ফলে বিদ্যমান অধিপতিশীল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তাদেরকে প্রায়শঃই সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। যা তাদেরকে তাদের সংস্কৃতি, আচার, বিশ্বাস এমনকি তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ভূমি, পাহাড়, বন থেকে তাদের অধিকারকে রাষ্ট্রীয় বিশেষ কাঠামোর মধ্যে এনে খর্ব করা হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদশে দেখা যায় অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীরা ভূমিহীন হচ্ছে, উচ্ছেদ হচ্ছে তাদের হাজার বছরের প্রাচীন ভূমি থেকে, বন থেকে, পাহাড় থেকে।

রাষ্ট্রের বসবাসকারী হিসেবে অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীরও রয়েছে রাষ্ট্রের আর সকল নাগরিকের মতো সমান অধিকার প্রাপ্তির। কিন্তু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে তারা বছরের পর বছর থেকে রাষ্ট্রের মূল কেন্দ্র থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন এক প্রান্তে নিজেদের রীতি-নীতি ব্যবস্থায় বসবাস করে আসছে। কখনো ক্ষুদ্র জাতিসত্তা পরিচয়ে জাতীয়ভাবে সুনির্দিষ্ট কোন দিক্‌নির্দেশনা না

থাকায় আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং নিম্ন বর্ণের জনগোষ্ঠী সকলেই রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈষম্যের শিকার। এবং তারা তাদের ব্যক্তি পরিচয়ের চেয়েও অনেক বেশী তাদের সম্প্রদায়গত পরিচয়ের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে, পরিচিত হয়। একটি সামষ্টিক সত্তা হিসেবে বেড়ে ওঠার কারণে তারা প্রকৃতির যে উপাদানগুলো ভোগ করে তাতে তাদের ব্যক্তি অধিকারের চেয়েও সম্প্রদায়গত বা সামষ্টিক মালিকানা বা অধিকার মূখ্য হয়ে ওঠে। যা তারা অনুশীলন করে আসছে তাদের শত বছরের প্রাচীন জীবন ব্যবস্থা এবং প্রথানুসারী নিজস্ব আইন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যক্তি সম্পত্তি ধারণার প্রবল আধিপত্যে এই ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাধারণ সম্পত্তি বা সম্প্রদায়গত সম্পত্তি ব্যবস্থা ক্রমশ:ই চরম হুমকির মুখে বিলীন হয়ে পড়ছে। ফলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী ভূমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে, অভিবাসী হতে বাধ্য হচ্ছে কিংবা তাদের সার্বিক জীবনব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে যা তাদের সামগ্রিক অস্তিত্বকে সংকটময় করে তুলছে।

একটি বহু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীরাও এই বাস্তবতার বাইরে নয়। এদেশে বৃহত্তর বাঙালী জনগোষ্ঠী ছাড়াও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাস করে আসছে এসব জাতিগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে নিজস্ব সমৃদ্ধ সমাজ, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, ধর্ম-ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি নিয়ে এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। তাদের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, সামাজিক রীতিনীতি, ভৌগলিক পরিবেশ, দৈহিক-মানসিক গঠন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা ইত্যাদি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রাক ঔপনিবেশিক, ঔপনিবেশিক এবং উত্তর ঔপনিবেশিককাল থেকে শুরু করে অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্রেও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীরা রাষ্ট্রের নীতি, আইন ও সংবিধানে নানাভাবে উপেক্ষিত কিংবা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছে এই সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তা।

ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জীবনে প্রকৃতিই প্রধান অবলম্বন। এ কারণেই ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীদের বসবাসের ভৌগলিক স্থানগুলোকে দেখা যায় বন, পাহাড় কিংবা সমুদ্র উপকূলকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম, মধুপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, সিলেট, কক্সবাজার, বৃহত্তর খুলনা ও দেশের অন্যান্য বন, পাহাড় এবং সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের বাস। তবে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীদের বসবাসের ভিত্তিতে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের ৭ টি ভৌগলিক অঞ্চলকে চিহ্নিত করা যায়ঃ ১) **উত্তর-বাংলা অঞ্চল:** এ অঞ্চলের

প্রধান আদিবাসী জনগোষ্ঠী হচ্ছে-সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, মাহাতো, পাহাড়িয়া, মালো ইত্যাদি। এরা মূলতঃ প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড এবং দ্রাবিড়িয়ান। এরা বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর এবং পাবনা জেলায়। ২) **উত্তর গারো পাহাড় অঞ্চলঃ** এ অঞ্চলে বেশীরভাগ আদিবাসীই গারো। গাঁরোদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত। এছাড়াও রয়েছে হাজং, কোচ, বানাই, রাজবংশী, ডালু, বর্মণ ইত্যাদি। এই ক্ষুদ্র জাতিসত্তা মঙ্গোলয়েড এবং ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভূক্ত। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর এবং নেত্রকোণা জেলায় এদের বসবাস। ২০,০০০ এরও বেশী গারো টাঙ্গাইলের মধুপুর বনে বাস করে। ৩) **উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলঃ** মণিপুরী, খাসি, গারো, খারিয়া, পাত্র প্রভৃতি আদিবাসীরা এই অঞ্চলে বাস করে। জেলাগুলো হলো সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ। বেশীরভাগ আদিবাসীই মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভূক্ত। চা শ্রমিক হিসেবে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আদিবাসী চা বাগানে কাজ করে। ৪) **চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলঃ** এখানে ১১ টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে- চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরা, বম, লুসাই, ম্রো, খুমি, পাংখো, খিয়াং, চক, টাংগাছাংগা। এই পাহাড়ি আদিবাসীদের "জুম্ম" বলা হয়। ৫) **উপকূলীয় অঞ্চলঃ** রাখাইনরা বসবাস করে কক্সবাজার এবং বরগুণার উপকূলীয় অঞ্চলে। এরাও মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভূক্ত। ৬) **দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলঃ** এ অঞ্চলে সাঁওতাল, মুন্ডা, বুনো এরকম কিছু আদিবাসী এবং জেলে/মালো, পারৈ, পত্নি, তেলি, ধোপা, কর্মকার ইত্যাদি হিন্দু ও মুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায় নিম্নবর্ণের মানুষের বসবাস । এরা বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে বাস করে। ৭) **বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলঃ** বর্মণ, গাঁরো, কোচ এবং আরো কিছু আদিবাসী এখানে বাস করে। এরা প্রধানতঃ ভাওয়াল বনাঞ্চলে বাস করে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা যে নিবিড় সম্পর্ক তা তাদের বসবাসের ভৌগলিক অবস্থান থেকেই স্পষ্ট।

কিন্তু যুগ যুগ ধরে নানা কারণে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার এই অবস্থান কিংবা জীবন ব্যবস্থাকে ঔপনিবেশিক, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় হলো রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্ধারিত প্রাকৃতিক সম্পদে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার এবং সনাতন প্রথানুযায়ী তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। এতে প্রাকৃতিক সম্পদকে রাষ্ট্র যেখানে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বিবেচনায় বিবেচনা করে থাকে সেখানে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কাছে এই জল, জঙ্গল, জমি বিশেষ আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক অর্থময়তা বহন করে। কিন্তু রাষ্ট্র যখন এই প্রাকৃতিক সম্পদে অনুপ্রবেশ করে তখন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা জীবন, সংস্কৃতি এবং যুগ যুগ ধরে তারা যে সম্পদ ব্যবহারে যৌথ বা সম্প্রদায়গত ব্যবস্থাপনা এবং মালিকানার মধ্য দিয়ে এসেছে তাতে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এবং রাষ্ট্র তা কখনোই বিবেচনা করে দেখেনা।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নিয়ে কোন ধরনের আলোচনা হলে সাধারণের একটি ধারণা দেখা যায়- তা হলো ক্ষুদ্র জাতিসত্তা মানেই যেন পাহাড়ি এলাকায় বসবাসরত আদিবাসী জনগণ। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে। তবে এছাড়াও সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের আলোচনায় রাখাইন, ভাওয়াল বনাঞ্চলের গারো, কোচ এরা আলোচনায় আসে। সে তুলনায় বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকায় বসবাসরত আদিবাসী কিংবা ভিন্ন ধর্মীয় জাতিতাত্ত্বিক সংখালঘু সম্প্রদায় দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায় যাদের অধিকাংশই অন্ত্যজ। কিন্তু সামজিক-সাংস্কৃতিক বৈচিত্রে এরা বাংলাদেশের সামগ্রিক বৈচিত্রময় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত সমস্যা, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে কিছু দিক নির্দেশনা এবং রাষ্ট্র কর্তৃক তাদের আভ্যন্তরীণ বিধিব্যবস্থার প্রতি কিছুটা সহনশীলতা প্রদর্শন করলেও সমতল বা উপকূলীয় আদিবাসী ও ক্ষুদ্র ধর্মীয় জাতিসত্তার ভূমির অধিকার, ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদে তাদের অনুপ্রবেশ ও মালিকানা বিষয়ে কোন দিক নির্দেশনা নেই। এমনকি ভূমিকে কেন্দ্র করে তাদের নিজেদের যে ব্যবস্থা তার সাথেও রাষ্ট্রের রয়েছে ভিন্ন অবস্থান। এছাড়াতো রয়েছেই ভূমিকে কেন্দ্র করে নিত্যকার শোষণ ও নির্যাতন।

## ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সমূহের জীবন-জীবিকা ও প্রাকৃতিক সম্পদঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের অন্ত্যজ জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে বেশ কিছু ধর্মীয় ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা জনগোষ্ঠীর দেখা মেলে। ১৯৯৬ সালে খুলনা এবং সাতক্ষীরা জেলার ২ টি থানায় একটি স্থানীয় জরীপে দেখা যায় যে, এখানে ২০ টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অনুসারীরা রয়েছে।

**বুনো বা মুন্ডাঃ** ১৯ শতকে বৃটিশ রেড ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক সুন্দরবনের কিছু অংশ যেসকল জমিদারেরা বরাদ্দ পেয়েছিলো তারা সুন্দরবন পরিষ্কার করে এখানে চাষাবাদের জন্য মুন্ডাদের নিয়ে আসে। দেখা যায় এখানকার জমি ও বন পরিষ্কার করে চাষাবাদের উপযোগী করার পরেও তারা এখানে শ্রমিক হিসেবে থেকে যায়। তারা আর তাদের ঐতিহ্যবাহী মৎস্য এবং পশু শিকারে ফিরে যায়নি, মজুরী শ্রমিক হিসেবে কৃষি এবং অকৃষি শ্রমে নিয়োজিত হয়।

**কাইপুত্র বা কেওরা:** এরাও এখানকার একটি অতি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা যাদের মাত্র শতকরা ১ ভাগ বা তার চেয়েও কম মানুষের রয়েছে চাষাবাদযোগ্য নিজের জমি। তাদের প্রধান পেশা মূলত: শুকর পালন (৬০%) যার ফলে অন্য সম্প্রদায়ের কাছে তারা অচ্ছুৎ।

**পুন্দ্র ক্ষত্রিয়:** যদিও জেলা গেজেটিয়ারে এদেরকেও নমশুদ্র হিসেবে বলা হয়েছে কিন্তু এই দুটো সম্প্রদায়ই নিজেদেরকে আলাদা হিসেবে চিহ্নিত করে। সংখ্যা বিবেচনায় এরা নমশুদ্রের পরের অবস্থানে। এই অঞ্চলে ক্ষত্রিয়রা এসেছে মুলত: উত্তর থেকে শত বছর আগে বন পরিষ্কার এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য দূর অতীতে, বিস্তৃত ভুমি, জলাশয় এবং বন তাদের সম্মিলিত মালিকানা এবং সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাদের অনেকেই ভূমিহীন এবং দরিদ্র। এবং অন্যান্য রাষ্ট্রায়াত্ত্ব প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন মুক্ত জলাশয় কিংবা বন ব্যবহারেও তাদের জন্য রয়েছে নানাবিধ বিধিনিষেধ বা সীমাবদ্ধতা। অন্যান্য সংখ্যালঘুদের তুলনায় কৃষিকাজে যুক্ত হওয়ার হার তাদের অনেক বেশী।

**রাজবংশী:** যদিও এরা একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কৃতি, প্রথা ইত্যাদির দিক থেকে প্রায় নমশুদ্র এবং পুন্দ্র ক্ষত্রিয়দের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এরা এসেছে মূলত: জেলে সম্প্রদায় থেকে। ঐতিহাসিক অনেক পটপরিবর্তন, দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার রূপান্তর তাদেরকে তাদের বহুদিনের নদী ও অন্যান্য মুক্ত জলাশয়ের অবাধ অনুপ্রবেশ থেকে বিতাড়িত করে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে তাদের জীবিকার ক্ষেত্র।

**অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়:** এ অঞ্চলে আরো কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেখা যায় যেমন- জেলে/মালো, পারৈ, পাটনি, তেলি ইত্যাদি। এরা নিজেদের হিন্দু হিসেবে দাবী করলেও উচ্চ এবং মধ্য বর্ণের হিন্দুরা তাদেরকে নিম্নবর্ণের হিন্দু হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। তেলি সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণত বীজ থেকে তেল সংগ্রহ করার পেশায় নিয়োজিত থাকে। পাটনি সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐতিহ্যগতভাবে মাঝি। জেলে/মালো এবং পারৈ সম্প্রদায়ের লোকেরা মূলত: মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো। কিন্তু বর্তমানে তাদের বেশীর ভাগ লোকই এখন আর আগের পেশায় নেই। দৈহিক গঠনের দিক থেকে এরা অনার্য। অষ্ট্রলয়েড এবং দ্রাবিড়িয়ান জাতিগোষ্ঠীর মিশ্রণ। এখন তাদের বেশীরভাগই কৃষি ও অকৃষি মজুরী শ্রমে যুক্ত।

**মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়:** যদিও মুসলিমদের মধ্যে বর্ণপ্রথা স্বীকৃত নয় তদুপরি এখানে নয় ধরনের স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় দেখা যায়। যারা মুসলমান হিসেবে পরিচিত। তাদের সাথে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সাদৃশ্য রয়েছে। এরা নিম্ন বর্ণের হিন্দু থেকে মুসলমানে ধর্মান্তরিত হয়েছে। এরা হলো বাজন্দ্র (এরা বাদ্যযন্ত্র বাজায়), বেহারা (বাহক), দাই (বীজ থেকে তেল সংগ্রাহক, এদের বেশীরভাগের সাথেই হিন্দু তেলি'র সাদৃশ্য রয়েছে, সম্ভবত তারা তেলী সম্প্রদায় থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান), ধোপা, হাজাম, নিকারি (ঐতিহ্যগতভাবে জেলে, তবে এখন তারা বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত, এরা সম্ভবত: হিন্দু জেলে সম্প্রদায় থেকে ধর্মান্তরিত), রসুয়া (ঐতিহ্যগতভাবে গৃহস্থালীর বিভিন্ন তামা-ব্রোঞ্জের তৈজসপত্র মেরামতের কাজ করে), এবং শাহজী ও শিকারি। শাহজী সাতক্ষীরা থানার দেবহাটায় বসবাসরত ক্ষুদ্র একটি সম্প্রদায় ।

## সম্পত্তির ধারণাঃ ব্যক্তি, সাধারণ বা যৌথ এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা

**মালিকানার বৈচিত্রের ভিত্তিতে সম্পত্তির ধরণকে চারভাগে চিহ্নিত করা যায়-**

১. **রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি:** এখানে সম্পদ ব্যবহার বা অনুপ্রবেশে একটি নিয়ন্ত্রণকারী/ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের নিয়ম নীতি রয়েছে যা রাষ্ট্রায়াত্ত্ব এবং যা অনুসরণ করা সাধারণের দায়িত্ব। রাষ্ট্রীয় এই প্রতিষ্ঠানের অধিকার রয়েছে সম্পদ ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও অনুপ্রবেশে নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করার।

২. **ব্যক্তিগত সম্পত্তি:** এই ক্ষেত্রে ব্যক্তির সামাজিকভাবে প্রচলিত আইন অনুসারে সম্পদের মালিকানা সাপেক্ষে অধিকার রয়েছে। এটা হতে পারে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে। এবং যাদের এরূপ মালিকানা নেই তাদের এমন সম্পদ ব্যবহার থেকে বিরত রাখবার আইনগত সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকবে যা রাষ্ট্র নির্ধারিত এবং পরিচালিত। যাদের সম্পত্তির মালিকানা নেই তারা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য এসকল সম্পদ ব্যবহার থেকে বিরত থাকলেও প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাদের এই সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে।

৩. **সাধারণ বা যৌথ সম্পত্তি:** এই সম্পদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দলের বা সম্প্রদায়ের উপর। এই ব্যবস্থাপনা দলই মূলত: সম্পদের স্বত্ত্বাধিকারী। যারা তাদের গোত্র বা দলের সদস্যভূক্ত নয় তাদেরকে এই সম্পদে প্রবেশে বাধা দেয়ার অধিকার তাদের রয়েছে। এবং যারা সদস্যভুক্ত নয় তাদের দায়িত্ব এই বিধিনিষেধ মেনে নেয়ার। ব্যবস্থাপনা বা স্বত্ত্বাধিকারী দলের স্বতন্ত্র সদস্যের এই সম্পদের দেখভাল, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সাথে এর ব্যবহারের অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশে সাধারণ বা যৌথ মালিকানার ধারণা প্রচলিত নয়।

৪. **এজমালি সম্পত্তি:** এতে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, দল বা স্বত্ত্বাধিকারী থাকেনা এবং এতে কারো কাছে কোন ধরনের অর্থনৈতিক প্রাপ্তির বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকেনা। এবং এর ব্যবহারের কিংবা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ব্যক্তি বা স্বতন্ত্রের উপর বর্তায় না। তবে এটি সকলের মুক্ত অনুপ্রবেশের ক্ষেত্র। এজমালি সম্পত্তি, যৌথ মালিকানার ধারণা থেকে ভিন্ন কারণ, এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট কারোর উপর ন্যাস্ত নয়, যা যৌথ সম্পত্তির ক্ষেত্রে ভোক্তা দল বা সম্প্রদায়ের উপরে থাকে।

সম্পদের ধারণা নিয়ে নানাবিধ আলোচনা বিদ্যমান। সম্পদ বলতে কি বোঝায় এই আলোচনায় **'প্রাপ্তি'** যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনি এর ব্যবহারকারীদের **'অধিকার এবং দায়িত্ব'** বিশেষভাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এখানে কখনো ব্যক্তি, কখনো রাষ্ট্র, কখনো নাগরিক সাধারণ, কখনো বিশেষ কোন সম্প্রদায় ভোক্তা। ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্রীয় মালিকানার ক্ষেত্রে ভোক্তার অধিকার ও দায়িত্ব দুটো বিষয় স্পষ্টত:ই দৃশ্যমান থাকে। কারণ ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্র সম্পদ ভোগ করে এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। যার ফলে সে এই সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ বা ব্যবস্থাপনা করে থাকে, যা আবার সম্পদের প্রতি সম্পদ ব্যবহারকারীর দায়িত্ব। আর **'প্রাপ্তি'**র ধারণাকে কেন্দ্র করেই ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকা সম্পদ আসলে সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে।

ফলে ব্যক্তি মালিকানার বাইরে সম্পদের ধারণায় **'লভ্যাংশ কিংবা প্রাপ্তি'** সবসময় আর্থিক মূল্যায়নে পরিমাপ করা যায়না। বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন-বন, পাহাড়, জলা ইত্যাদি। **রাষ্ট্র বিশেষ করে বাংলাদেশে রাজস্ব আয়ের মূল উৎস হচ্ছে খাজনা তা সব ধরনের জমি যেমন-খাস জমি, আবাদযোগ্য ভূমি, জলা কিংবা বনভূমি সকলের ক্ষেত্রে একই। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র কাঠামো প্রাকৃতিক সম্পদের ভোক্তা এবং ভূমি সত্ত্বাধিকারীর ব্যবহারের সীমারেখা নির্ধারণ করেনা কিংবা করতে পারেনা।**

প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে সাধারণত: ভোক্তা হচ্ছে কোন বিশেষ সম্প্রদায় যারা বিশেষত: ক্ষুদ্র জাতিসত্তাভূক্ত। অনেক দেশেই এই সম্পত্তিকে সাধারণ বা যৌথ সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে দলগত বা সম্প্রদায়গত মালিকানা বা ব্যবহারকারী থাকে, যারা এর ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহারকে নিজেদের মতো করে নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারণ করে। আবার কোন কোন দেশে এই সম্পদে সকল নাগরিকের উন্মুক্ত অনুপ্রবেশ থাকে। এক্ষত্রে প্রচলিত ধারণা অনুসারে ওই সম্পত্তি সকলের কিন্তু বাস্তবে তা কারো সম্পত্তিই নয়। যার অর্থ আসলে যে সম্পদে সকলের অনুপ্রবেশের অধিকার রয়েছে সে সম্পদে নির্দিষ্ট কারো মালিকানা বা সংরক্ষণের অধিকার নেই।

যৌথ বা সাধারণ সম্পত্তির সাথে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বা প্রাকৃতিক সম্পত্তির ধারণা কখনো কখনো দ্বন্দ্ব তৈরী করে। বিশেষত: যখন ভোক্তা হয় ক্ষুদ্র জাতিসত্তা জনগোষ্ঠী। প্রাকৃতিক সম্পদের যৌথ অথবা সম্প্রদায়গত ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা তাদের মধ্যে প্রচলিত ।

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা বিকাশের সাথে সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের আইন, নীতি এবং দর্শনের পরিবর্তন সম্পদের মালিকানা, এর সংজ্ঞায়ন এবং ব্যবস্থাপনায়ও পরিবর্তন এনেছে যা মূলত: ভোগ এবং সম্পদ আহরণের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে নিজেদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, ঐতিহ্য, আচার এবং ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র জাতিসত্তা জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের ব্যবস্থা অনুসরণ করে এসেছে। যাতে ব্যক্তি মালিকানার উর্ধ্বে সম্প্রদায়গত মালিকানার ধারণা প্রাধান্য পায়। এখানে ব্যক্তি ভোক্তা নয়, সংরক্ষক।

**যেহেতু জল, জঙ্গল, জমি আদিবাসী ও ভিন্ন ক্ষুদ্র ধর্মীয় জাতিসত্তা সম্প্রদায়ের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বনের একটি সেহেতু এটি ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা এবং অধিকার ভোগের ক্ষেত্রেও তাদের রয়েছে স্বকীয় ঐতিহ্যগত এবং প্রথানুসারী আইন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। বন, পাহাড়, নদী, ভূমি এরূপ প্রকৃতির যে উপাদানগুলো রয়েছে তা তারা নিজেদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ঐতিহ্যগত প্রথানুসারী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রের অধিপতিশীল ব্যবস্থায় তাদের এই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আরো অনেক বিষয়ের মতোই সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। যা তাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে।**

## সাধারণ বা যৌথ সম্পত্তি ও ব্যক্তি সম্পত্তি ঃ ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার

সাধারণ সম্পত্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে সে সম্পদের ক্ষেত্রে যে সম্পদে সকলের মুক্ত অনুপ্রবেশের অধিকার রয়েছে এবং যেখানে দেশের প্রচলিত ভূমি অধিকার আইন প্রযোজ্য নয়। এবং যে সম্পদের নানাধরনের ব্যবহারকারী রয়েছে। এটি ব্যক্তি সম্পত্তির সাথে বৈপরীত্য প্রদর্শন করে। ব্যক্তি সম্পত্তি আইন বলতে ব্যক্তি মালিকানার সম্পত্তির কথা বলা হয় যাতে রাষ্ট্রকে নামমাত্র খাজনা পরিশোধ করলেও রাষ্ট্র এর সরাসরি মালিকানা ভোগ করে না। সাধারণত: বন, পাহাড়, ঝর্ণা, নদী ইত্যাদি রাষ্ট্রের সাধারণ সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। যেখান থেকে এর উপর নির্ভরশীল সম্প্রদায়ের লোকেরা বিনামূল্যে কাঠ, পানি, মাছ প্রভৃতি তাদের জীবন ধারণের লক্ষ্যে সংগ্রহ করে থাকে।

সাধারণ সম্পত্তি অধিকার বিষয়ে যে ধারণা নির্দেশ করে তা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট দল, গোত্র বা সম্প্রদায় কোন প্রাকৃতিক উৎস থেকে নিজেরা সমন্বিতভাবে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ করতে পারে। যাতে ঐ প্রাকৃতিক উৎসে তাদের ব্যক্তি মালিকানা নয় বরং সবার সম্পত্তি হিসেবে সামষ্টিক বা সম্প্রদায়গত মালিকানা ও অধিকার থাকে। যদিও বেশীরভাগ উন্নয়নশীল দেশেই প্রাকৃতিক সম্পদে ব্যক্তির অনুপ্রবেশ, ব্যবহার বা অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করে সাধারণ সম্পত্তি আইন। তবে সাধারণ সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই সম্পদের ব্যবস্থাপনা এবং সম্প্রদায় বা দলের সম্মিলিত মতামত। সাধারণ বা যৌথ সম্পত্তি ধারণায়িত করতে গিয়ে দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য-১. সম্পদ ব্যবস্থাপনার অধিকার ২. সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার।

সম্পদ ব্যবস্থাপনার অধিকারের পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত হলো-অনুপ্রবেশ এবং ব্যবহারের অধিকার। অনুপ্রবেশের অধিকার বলতে বোঝায় অনুপ্রবেশযোগ্য একটি নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করা এবং ব্যবহারের অধিকার বলতে বোঝায় যে নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক উৎস থেকে সম্পদ আহরণ করা যাবে তা আহরণ বা ব্যবহারের অধিকার। এই অধিকারের সাথে সাথে বর্তায় সংরক্ষণের দায়িত্ব।

ব্যক্তি সম্পত্তি আইন বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় অধিপতিশীল ভূমি বা সম্পত্তি মালিকানা ব্যবস্থা। এতে রাষ্ট্রকে নামমাত্র পরিমাণে খাজনা পরিশোধের মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানায় ভূমির অধিকার নির্ধারিত। বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে ভূমির মালিকানা হস্তান্তর হয়। এবং ব্যক্তি নিজ মতামত বলে ভূমি বিক্রির অধিকার রাখে। ব্যক্তি সম্পত্তি আইন বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। বেশিরভাগ দেশেই ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাথে ভূমি অধিকার বিষয়ক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এই ব্যক্তি সম্পত্তি আইনের সাথে সাধারণ সম্পত্তি অধিকরের অসামঞ্জস্যতা তৈরী হয় যা অধিপতিশীল ব্যক্তি মালিকানা ব্যবস্থার বিপরীতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রথানুসারী সাধারণ বা যৌথ সম্পত্তি অধিকারের বিষয়টি প্রান্তিক হয়ে পড়ে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্ত্বার উপর জোর দিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র অধিকারের প্রতি জোর দিয়েছে। অর্থাৎ এতে ব্যক্তি সামষ্টিকের চেয়েও তার স্বতন্ত্র অধিকার, মতামত গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীর বসবাস একটি সামষ্টিক দল হিসেবে। পূর্বের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা যুগ যুগ ধরে যে সামষ্টিক অধিকারের চর্চা করে আসছে সাংস্কৃতিকভাবে অধিপতিশীল বা প্রবল সংস্কৃতি তার পরিবর্তে

ব্যক্তিক অধিকারের বিষয়টি তাদের উপর চাপিয়ে দিলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি বিলীন বা বিজড়িত হয়ে যাওয়ার ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সামষ্টিক অধিকারের বিষয়টিতে তাদের স্বতন্ত্র স্বকীয় ইতিহাস, পরিচিতি এবং সংস্কৃতির সাথে সাথে আরো যুক্ত করে ভূমি, এলাকা এবং যে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে তারা জীবন ধারণ করে তাতে তাদের সামষ্টিক অধিকারের বিষয়সমূহ। এবং তাদের এই সামষ্টিকতা, তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, জ্ঞান এবং সংস্কৃতির অংশ।

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা যে এলাকায় বেড়ে উঠেছে সেই এলাকা, ভূমি তাদের দৈনন্দিন চাহিদা, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ভূমি এবং এলাকায় রয়েছে তাদের সামষ্টিক বা সম্প্রদায়গত মালিকানা। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী ঐতিহ্যগতভাবেই শুকনো ভূখন্ডে পশুচারণ, শিকার এবং সংগ্রহ, মৎস্য শিকার, চাষাবাদসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সামগ্রিক জীবন যাপন একটি ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিবেশের অপরিহার্য অংশ। সুতরাং কোন ধরনের বহিরাগত অনুপ্রবেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষেরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের সাংস্কৃতিক, প্রতিবেশগত এবং অন্যান্য সকল দিক থেকে। ভূমি, বন, এলাকা, পানি, ভূখন্ড, জলাভূমি সবই ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কাছে সমন্বিত সম্পদ যা তারা যত্নের সাথে লালন করে প্রয়োজনীয় উপকরণ এখান থেকে আহরণ করে জীবন ধারণ করে। তারা একভাবে এইসকল প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষক রূপে ভূমিকা পালন করে।

**আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভূমির অধিকার**

আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ এ অনুস্বাক্ষর করার পরও কোন কোন সরকার ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকারকে স্বীকার করে ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, এর আলোকে আইন প্রণয়ন করেনি। এ কনভেনশনের মূল কথা হলো, **ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কাগজ বা দলিল থাকুক বা না থাকুক, যে জমি ঐতিহ্যগতভাবে তারা ব্যবহার করে আসছে, সে জমি তাদের।**

আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ এর দ্বিতীয় অংশের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, **"সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্যদের ঐতিহ্যগতভাবে অধিকৃত ভূমির উপর যৌথ কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করতে হবে।"**

অনুচ্ছেদ ১২ বলছে, **"জাতীয় নিরাপত্তা কিংবা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিংবা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কারণে দেশের আইন এবং বিধি ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে তাদের আবাসভূমি থেকে তাদের স্বাধীন**

**সম্মতি ছাড়া বাস্তচ্যুত করা যাবে না।"** কখনো যদি বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীকে সরানোর প্রয়োজন হয়, তখন তাদের সম্মতিতে পূর্ণ নিশ্চয়তাসহ ক্ষতিপূরণ প্রদানের কথা বলা হয়েছে, সেটি হবে ভালো মানের জমি অথবা নগদ অর্থ। অনুচ্ছেদ ১৩ বলছে, **" সংশিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদেরকে এসব প্রথার সুযোগ গ্রহণ অথবা এসব জনগোষ্ঠীর সদস্যদের আইন সম্পর্কিত অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জমির মালিকানা লাভ কিংবা ব্যবহার করা থেকে নিবৃত্ত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"**

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন সাধারণ পরিষদে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার ঘোষণাপত্র গৃহীত হওয়ার ঘটনাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, আজ ১৩ সেপ্টেম্বর একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সূচনা হলো যেখানে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণ তাদের দু:খময় ইতিহাস দূর করে একত্রে সকলের জন্য মানবাধিকার, ন্যায্যতা ও উন্নয়নের পথ খুলে দিতে পারবে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ঘোষণাপত্রের ৪৬ টি ধারার ১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত যেভাবেই হোক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী জাতিসংঘের সনদ, সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন সমূহে বর্ণিত সকল অধিকারসমূহ ভোগ করবে।

**উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিকভাবে জমিতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ব্যক্তি এবং সামষ্টিক বা যৌথ মালিকানা স্বীকৃত হলেও বন, পাহাড়, জলাভূমির মতো প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে তা এখনও স্বীকৃত নয়।**

## অন্ত্যজ জনগোষ্ঠী : প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভূমির অধিকার

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৯, চট্টগাম জেলা প্রশাসন নাথপাড়ার কারোল গ্রামের অধিবাসীদের ১৪ অক্টোবরের মধ্যে তাদের গ্রাম ছেড়ে দেয়ার জন্য নোটিশ দেয় এবং এই এলাকার মালিকানা দাবী করে। অধিবাসীরা এই নোটিশের কোন জবাব না দিলে এবং গ্রাম ছেড়ে না দিলে চট্টগ্রাম এবং পটিয়া উপজেলা প্রতিনিধি হিসেবে পটিয়া পুলিশে তাদের এই এলাকা থেকে উচ্ছেদে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। অধিবাসীরা সবাই মিলে এর প্রতিবাদ করে।

### অন্ত্যজ জনগোষ্ঠী উচ্ছেদ: নিজভূমে পরবাসী

এখানে ৩০০ পরিবার পুরুষাণুক্রমে বসবাস করে আসছে। প্রজন্মান্তরে তারা জলজ উদ্ভিদ থেকে গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র তৈরী করে। এবং তারা যদি এই এলাকা ছেড়ে চলে যায় তাহলে এটি তাদের সার্বিক জীবন ব্যবস্থায় বড় ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। এবং তারা

দাবী করে যে তাদের পূনর্বাসনের যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিলো তা পর্যাপ্ত ছিলোনা। যে ৫০,০০০ টাকা তাদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয়ার কথা ছিলো তা দিয়ে তাদের পক্ষে কোনভাবেই অন্যত্র চলে যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে জমি কেনা সম্ভব হতোনা এবং এই টাকা তাদের বর্তমান জমির মূল্যের কাছাকাছিও না। এবং কর্তৃপক্ষ এই পুরো প্রক্রিয়াটি আইনসম্মত ও যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করেও করেনি। যদিও এসকল ক্ষেত্রে আইন অনুসরণ করা আবশ্যক। নাথপাড়া অধিবাসীদের মতে, যেহেতু তারা নিম্ন বর্ণের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সেহেতু তারা শোষন এবং নিপীড়নের লক্ষ্যবস্তু। বাংলাদেশের আর সকল নিম্ন বর্ণের জাতিসত্তার মতো তারাও প্রান্তিক। তাদের বেশীরভাগেরই প্রতিদিন ত্রিশ টাকা মাথাপিছু উপার্জনে টিকে থাকতে হয়। তারা সরকার থেকে কোন সামাজিক নিরাপত্তা পায়না এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়:নিষ্কাশন ক্ষেত্রে তাদের অনুপ্রবেশের হার খুবই সীমিত। এই এলাকায় উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন শুরু হলেও একমাত্র তারাই আছে এই উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং পরিকল্পনার বাইরে। এই সম্প্রদায়ের দুই নেতা-শ্রীমত সুভাসানন্দ এবং দিলিপ দে দাবী করেন যে তাদেরকে আসলে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। যেকোন উপায়ে তাদেরকে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করাই প্রশাসনের লক্ষ্য। এবং তারা কারো কাছ থেকেই কোন সহায়তা পাচ্ছেন না। এমনকি তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন অফিসিয়াল চিঠিও দেয়া হয়নি। শুধুমাত্র নিম্ন বর্ণের সংখ্যালঘু বলেই তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু করে উচ্ছেদের চেষ্টা করা হচ্ছে।

**সামাজিক বনায়ন ও আদিবাসী উচ্ছেদ**

উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ, পার্বতীপুর, বিরামপুর, ঘোড়াহাট, বিরল ও বীরগঞ্জ উপজেলায় আদিবাসীদের পৈতৃক ভূমি। এখানে তারা দীর্ঘদিন থেকে বসবাস করে আসছে। কিন্তু এডিবি'র আর্থিক সহায়তায় বনবিভাগ সামাজিক বনায়নের নামে আদিবাসীদের পৈতৃক সম্পত্তিকে বন বিভাগের শত্রু সম্পত্তি হিসেবে দাবি করে বনায়নের মাধ্যমে বাগান সৃষ্টি করে। এভাবে বনবিভাগ কর্তৃপক্ষ উত্তর বঙ্গের আদিবাসীদের প্রায় সাড়ে ছয় হাজার একর জমি কেড়ে নিয়েছে। এভাবে বেদখল হওয়া জমির পরিমাণ আরো অনেক বেশী। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা অনুযায়ী জমি মালিকদের বাগানের অংশিদারীত্ব বা উপকারভোগীর তালিকায় রাখার সিদ্ধান্ত থাকলেও কোন আদিবাসীকে উপকারভোগী হিসেবেও নেয়া হয়নি। এক্ষেত্রে আদিবাসীদের উপর কখনো কখনো মিথ্যা মামলাও দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও আশ্রয়নের নামে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বড়দল মৌজায় ৬৫টি আদিবাসী সাঁওতাল পরিবারকে

যারা খাসজমিতে বসবাস করতো তাদেরকে স্থানীয় চেয়ারম্যান ঘরবাড়ি ভেঙে তাড়িয়ে দেয়। বনায়ন কিংবা আশ্রয়ন প্রকল্পের নামে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এতে সবসময়ে যে সরকারের হস্তক্ষেপ থাকে এমনও নয়। অনেকসময় দেখা যায় অসাধু বাঙালী বনবিভাগের কর্মচারী বা কর্মকর্তাদের লোভের কারণেও আদিবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত বা ভূমিহীন হচ্ছে। এতে দেখা যায় আদিবাসীদের জমি সামাজিক বনায়ন বা আশ্রয়নের নামে জোর দখল করে এসকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বিক্রি করে দেয়। এতে আর্থিকভাবে সরকার যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অন্যদিকে বনবিভাগের এসকল অসাধু কর্মকর্তারা অন্যায়ভাবে লাভবান হচ্ছে। আর আদিবাসীরা উচ্ছেদ হচ্ছে শতাব্দী প্রাচীন তাদের ভূমি থেকে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সুন্দরবন প্রাকৃতিক সম্পদের এক গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশাল উৎস। একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পেশার ও সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস-যাদের অধিকাংশই অন্ত্যজ। বিশেষ করে মাওয়াল, কাঠুরে এবং জেলে সম্প্রদায়। প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস হিসেবে সুন্দরবন এ এলাকার মানুষের জীবন এবং জীবিকার অপরিহার্য অংশ। সুন্দরবনের উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জন্য এর পাশের সমুদ্র, নদী এবং খালের পানি প্রধানতম প্রাণশক্তি। একই ভাবে এই পানি সুন্দরবন অধ্যুষিত এলাকা ও সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনে অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে আসছে। সুন্দরবন অধ্যুষিত সমুদ্র, নদী এবং খাল সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ পরিবেশ ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক পরিচিতি এবং প্রতিবেশগত প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু একই সাথে বৃহৎ আকারের পানি ব্যবস্থাপনার কারণে যে বহিরাগত প্রভাব তৈরী করে তা সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দেয়।

বাংলাদেশে সাধারণ সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রায়াত্ব সম্পত্তির ধারণা যেহেতু স্পষ্ট নয় তাই সাধারণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের অংশ হিসেবে সামগ্রিক পানি ব্যবস্থাপনার খুব ক্ষুদ্র অংশই পরিচালিত হয়ে থাকে। এটি সুন্দরবন এবং এর বিশাল এলাকার ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। আসলে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তেমন কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা কিংবা প্রয়োগ না থাকার কারণে এই বিশাল অঞ্চলের কোথাও ব্যক্তি সম্পত্তি হিসেবে, কোথাও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, কোথাও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সাধারণের সম্পদ এবং কোথাও কোথাও একটি মুক্ত অনুপ্রবেশের ক্ষেত্র হিসেবে এর ব্যবস্থাপনা হচ্ছে। এর ফলে দেখা যায় শত শত বছর ধরে যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষেরা এই এলাকায় বসবাস করে আসছিল, নিজেদের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে তারা সুন্দরবনের জল, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে জীবন ধারণ করে আসছিল তারা এখন বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে।

হিন্দু নিম্ন বর্ণের পুন্ড্র ক্ষত্রিয়, রাজবংশী, জেলে/মালো, পারৈ, পাটনি, তেলি ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোকেরা যারা এই অঞ্চলের উন্মুক্ত জলাশয় ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতো তারা সুন্দরবন, এর প্রাকৃতিক সম্পদ ও পানি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন নীতিমালা, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বহিরাগত হস্তক্ষেপের কারণে এসব এলাকা থেকে চলে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে ভূমিহীন মজুরী শ্রমিক হিসেবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে।

ঔপনিবেশিক কালেও, ১৯২১ সালের কর সংক্রান্ত ব্যবস্থায় সুন্দরবনের পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে তেমন কোন সুপরিকল্পিত উদ্যোগ ছিলোনা। যদিও এ বঙ্গভূমিতেই জলকরের ব্যবস্থাপনা বহু প্রাচীকাল থেকেই প্রচলিত ছিলো, যা মূলত ব্যবহার হতো পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায়। কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকারের মূল আগ্রহের জায়গা ছিলো কর, যেখানে সামগ্রিক উন্নয়নের কোন চিন্তা ছিল না। যেহেতেু ভূমি ছিলো কর আদায়ের সবচেয়ে উপযোগী ক্ষেত্র সেহেতু তারা পানি ব্যবস্থাপনার চেয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রতিই অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। পানিকে বিবেচনা করা হতো ভূমির সাথে যুক্ত আরো কিছু অন্যান্য সম্পদের মতো সম্পূরক হিসেবে। যদিও শ্রমিকদের শ্রমে উৎপাদিত কাঠ, খাদ্য, মাছ এবং সুতার উপর থেকেও কর আহরণ করা হলেও কর সংগ্রহের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত এবং নির্ধারিত ছিলো মূলত: ভূমিকে কেন্দ্র করে। ১৯২১ সালের এই বিধি ব্যবস্থায় পানিকে কর ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক সূচকে বিবেচনা করা না হলেও গত ১০০ বছরে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এটি ধীরে ধীরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাঁধ নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং সেচ ব্যবস্থাপনায় যা প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু তারপরও সুন্দরবন এবং এর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায়নি। যার ফলে দেখা গেছে যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহ যুগ যুগ ধরে যে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিলো এই সম্পদের ব্যবহারে তাদের আর কোন প্রাতিষ্ঠনিক স্বীকৃতি বা সুরক্ষা রইলো না।

ভূমির অধিকার প্রসঙ্গে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীর সঙ্কট আরো নিবিড়। প্রকৃতির উপরই পুরোপুরি নির্ভরশীল তারা। সরাসরি প্রকৃতি থেকে আহরিত হয় তাদের জীবন ধারনের অপরিহার্য উপাদান খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি।

ফলে তারা বসবাস করেন পাহাড়, বন, সাগরের মতো প্রকৃতির খুব কাছাকাছি। যেহেতু এই বন, পাহাড়, সমুদ্র থেকেই তাদের অপরিহার্য চাহিদার সংস্থান হয় সেহেতু তারা নিবিড় যত্নের সাথে এগুলো ব্যবহার করে থাকে। তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে বন ও ভূমিতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার রয়ে গেছে সামষ্টিক মালিকানা। এই মালিকানা ব্যক্তিক নয় বরং সম্প্রদায়ের সম্মিলিত। এতে সবাই মিলে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থা এবং প্রথায় ভূমি, বন ও সমুদ্রে তাদের বিচরণ, আহরণকে মেনে চলে। কিন্তু তাদের এমন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের রয়েছে নানাবিধ বিধিনিষেধ। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে গারো পাহাড়ের গারো আদিবাসী বা ভাওয়ায়েলর বন, সিলেটে কিংবা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার ক্ষুদ্র জাতিসত্তারা নানাভাবে উচ্ছেদ হচ্ছে ভূমি থেকে। পরিণত হচ্ছে ভূমিহীন মজুরী শ্রমিকে। স্বতন্ত্র নিয়ম-নীতি, সংস্কৃতি এবং সামাজিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সমাজ স্মরণাতীতকাল থেকে ভূমি, বনের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ নিজেরা যত্নের সাথে ব্যবহার করে আসছে সেই তারা এখন সরকারী অস্পষ্ট বা তাদের জন্য ক্ষতিকর এমন নীতিমালার জন্য ভূমিহীন মজুরী শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। যা তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। সামষ্টিকভাবে নিজ সংস্কৃতি ধারণ করে যে ক্ষুদ্র জাতিসত্তারা যুগ যুগ ধরে নিজ ঐতিহ্য ও ব্যবস্থাকে লালন করে আসছে এই ব্যবস্থায় তাই ক্রমশ:ই তা প্রান্তিক বা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

উন্নয়নের নামে বিভিন্ন প্রকল্পের কারণে এই ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নিয়মিতভাবেই উচ্ছেদ হয়েছে ভূমি থেকে অথচ তারা রয়ে গেছে সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাইরে, যেমন বাঁধ নির্মাণ (কাপ্তাই), ন্যাশনাল পার্ক, ইকো-পার্ক, সংরক্ষিত বনাঞ্চল, সদস্যরাই সামাজিক বনায়ন, মিলিটারি বেইস নির্মাণ, রসুলপুর বিমান বাহিনী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গাজনী অবকাশ কেন্দ্র ইত্যাদির কারণে ক্ষুদ্র জাতিসত্তারা বন ও ভূমি হারাচ্ছে।

সুতরাং যে আদিবাসী মধুপুর বনে কাগজপত্র বিহীন বসবাস করে, আনারস-আলু-আদা-পেঁপে বাগান করে, কিংবা সুন্দরবনে যে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী মধু আহরণ করে, কাঠ সংগ্রহ করে, কিংবা নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে সেখান থেকে তাদের উচ্ছেদ করা কিংবা তাদের অধিকার খর্ব করা স্পষ্টত:ই আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। আসলে বংশ পরম্পরায় এগুলোতে তাদের রয়েছে অধিকার। তাদের কাছ থেকে সরকার বা অন্যরা যদি সে জমি জোরপূর্বক কেড়ে নিতে চায়, সেটা হবে আন্তর্জাতিক সনদের লংঘন, যা মানবাধিকার লংঘন হিসেবে চিহ্নিত হবে। কিন্তু আইনের শাসনের অভাবে আন্তর্জাতিক সনদের বাস্তবায়ন না হওয়ায় এবং এসবের আলোকে আইন না থাকায় আদিবাসীরা ভূমি রক্ষা করতে পারছে না।

বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্বা আইনে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভূমি অ-আদিবাসীদের নিকট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সরকারি বিধিমালা থাকার পরও ক্ষুদ্র জাতিসত্তারা ভূমি হারাচ্ছে।

বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইনে ক্ষুদ্র জাতিসত্বার মধ্যে আদিবাসীদের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু উপধারা সংযুক্ত থাকলেও অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে বিশেষ কোন নির্দেশাবলী নেই। এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের অধিকার খর্ব করা হয়। বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইনে ১৯১৮ সালে আদিবাসীদের সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় তা প্রায় একইরূপে সন্নিবেশিত হয়েছে স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেন্যান্সি অ্যাক্টের ৯৭ নং ধারায়। এই আইনের আওতায় যে সকল আদিবাসী সম্প্রদায় অন্তর্ভূক্ত তারা হলো- সাঁওতাল, বানাই, ভূঁইয়া, ভূমিজ, ডালু, গারো, বর্মণ, হাজং, হো, খারিয়া, কোচ, মগ, মাল, সুরিযা, পাহাড়িয়া, সেচ, মুন্ডা, ওঁরাও এবং তুরী। এই ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে আদিবাসী হিসেবেই অনেক অন্ত্যজ জাতিসত্তা চিহ্নিত হয়েছে।

স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেন্যান্সি অ্যাক্টের ৯৭ নং ধারায় বিধানসমূহ কার্যকর করার বিষয়সমূহ কয়েকটি উপধারায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

ক. কোন আদিবাসী তার রায়ত বা জোত যদি কোন আদিবাসী নয় এমন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করতে আগ্রহী হয় তবে তাকে রাজস্ব অফিসারের বিবেচনা সাপেক্ষে হস্তান্তর কার্যকর করতে হবে।

খ. আদিবাসীদের নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এই ৯৭ ধারা কার্যকর হবেনা।

গ. কোন আদিবাসী ধর্মান্তরিত কিংবা তার ধর্মীয় পরিচয় দ্বারা এই ধারা প্রয়োগ বাঁধাগ্রস্ত হবেনা।

ঘ. সরকার ইচ্ছা করলে কোনো প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই ধারার বিধানসমূহ কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বাতিল করতে পারে।

স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেন্যান্সি অ্যাক্টের ৯৭ নং ধারা প্রসঙ্গে ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত্ব আইনের সপ্তম অধ্যায়। এরপর সংযোজিত নতুন অধ্যায়টি হলো সপ্তম "ক" অধ্যায়। এই অধ্যায়েই ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। আমাদের দেশের স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেন্যান্সি অ্যাক্ট ১৯৫০ এর ৯৭ ধারায় সপ্তম "ক" অধ্যায়টি অক্ষুণ্ন রাখা হয়। কিন্তু তথ্য প্রমাণে দেখা যাচ্ছে, ১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময়ে উত্তরবঙ্গে

ভূমিহীন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংখ্যা ছিলো প্রায় ২০% যা বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮৫% এরও বেশি এবং প্রতি বছর এই হার বেড়েই চলেছে। ফলে ৯৭ ধারা বহাল থাকলেও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভূমি হারানো, ভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া, নির্যাতি-নিপীড়িত হওয়া কখনোই থেমে থাকেনি। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভূমি অধিকার রক্ষা, বিভিন্নমুখী সমস্যা সমাধানে আলোচিত ৯৭ ধারা যে পর্যাপ্ত নয় তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

## কি কি কারণে অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীরা ভূমি হারায়

বারবার বাধ্যতামূলক দেশান্তরকরণ প্রক্রিয়া; ১৯৪৭ সালের পর থেকে গারো, হাজং, কোচ, ডালু, হদি, বানাই প্রভৃতি আদিবাসী ও অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীদের কয়েকদফা প্রাণরক্ষার জন্য জন্মভূমি ছাড়তে হয়। ১৯৬৪ সালে পাক সরকার সাম্প্রদায়িক আক্রমণ চালায়। তখন অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়। তাদের ফেলে যাওয়া জমি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রভাবশালীদের দখল চলে যায়। যারা পরবর্তীতে ফিরে আসে, তাদের মধ্যেও অনেকে জমি ফেরত পায়নি। ১৯৭১ সালেও অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীদের সবকিছু ত্যাগ করে দেশান্তরিত হতে হয়। বার বার দেশান্তরের ফলে তাদের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে।

- অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীদের কোন মতামত বা সম্মতি ছাড়াই অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীদের ভূমিতে বা এলাকায় জাতীয় উদ্যান, ইকো-পার্ক নির্মাণ, গজনী অবকাশ কেন্দ্র, সামাজিক বনায়ন প্রকল্প গ্রহণ।
- অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীদের ঐতিহ্যগতভাবে অধিকৃত, ব্যবহৃত ভূমিকে অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীদের না জানিয়েই রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা বা খাস করে দেয়া।
- উচ্ছেদ নোটিশ এবং শতশত মিথ্যা মামলা দিয়ে অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীদের হয়রানি।
- শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তি আইন।
- ভূমিলোভী চক্রের জাল দলিল, জোরপূর্বক জমি দখল।
- জমিজমা সংক্রান্ত আইন-কানুন, খারিজ, খাজনা, কাগজপত্র তৈরি ও সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতার অভাব।
- প্রজাস্বত্ত্ব আইন বলবৎ থাকার পরও এর যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়া এবং জেলা প্রশাসনে কোন অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীদের বিষয়ক অফিসার না থাকা ।
- সরকারি ভূমি অফিসে চরম দুর্নীতি ও অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ।
- ভূমি জরিপের সময় দুর্নীতি ও ঘুষ দিতে বাধ্য করা; ঘুষ না দিলে জমি খাস করে দেয়া।
- আইনের আশ্রয় না পাওয়া, এমনকি মামলায় জয়ী হলেও জমির দখল বুঝে না পাওয়া।

○ বছরের পর বছর এমনকি যুগের পর যুগ মামলা চালাতে গিয়ে আরো জমিজমা হারানো, নিঃস্ব ও সর্বশান্ত হওয়া।

## অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর জল, জঙ্গল, জমির অধিকার রক্ষায় কতিপয় দাবী

• বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা, যার মাধ্যমে অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর স্বকীয়তার পূর্ণ স্বীকৃত হয়।

• বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, আইন, প্রথা এবং জ্ঞান ব্যবস্থার বিষয়কে সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ ও বিকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

### নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার

• সকল অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন করা এবং এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হবেন ওই জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি।

• সকল অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা এবং যার গঠন প্রক্রিয়ায় এবং কাঠামোতে অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে।

• জাতীয় সংসদে অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ, জেলা পরিষদসহ সকল স্থানীয় সরকার পরিষদে অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

• জনসংখ্যা জরিপ প্রতিবেদনে ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার জনসংখ্যার ব্যাপারে অনেক ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ করাও হয়না। এই ত্রুটি দূর করার জন্য সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

• ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার ওয়ারিশ সার্টিফিকেট দেবার ক্ষমতা রয়েছে। এই সার্টিফিকেট দেবার ক্ষমতা প্রতিটি অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার ব্যবস্থা করতে হবে।

### সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞান ব্যবস্থা এবং মেধা অধিকার

• অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত কৃষি, পশুপালন, বনবিজ্ঞান এবং মেধা সম্পদ অধিকার ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

• পরিবেশ সংরক্ষণ কমিশন গঠন যার কাজ হবে পরিবেশ ও সংস্কৃতি সুরক্ষার জন্য গবেষণা করা ও বাস্তব পদক্ষেপের সুপারিশ প্রণয়ন করা, যাতে সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার পরিবেশ সংরক্ষণের বৈচিত্রময় চর্চা রপ্ত করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া যায়।

## ভূমির অধিকার

- ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার সামষ্টিক ও সাধারণ ভূমি অধিকার সংক্রান্ত আবহমান রীতি ও প্রথার আইনগত রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করা।
- ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার জন্য স্বতন্ত্র ভূমি কমিশন গঠন, যেখানে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে।
- ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার রেকর্ডকৃত বা রেকর্ডবিহীন যেসব জমি বন বিভাগ গেজেট নোটিশ করেছে এবং জরিপের সময় খাস হিসেবে রেকর্ড করেছে, সেসব জমি প্রকৃত মালিকের নিকট আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- বিশেষ আদালত অথবা বিচারালয় স্থাপনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার এলাকা হরণ এবং ভূমিচ্যুতি প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ বাস্তবায়ন করা এবং এর আলোকে আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা; ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রথাগত আইন ও রীতিনীতির স্বীকৃতি প্রদান করা।
- শত্রু সম্পত্তি আইন অবিলম্বে বাতিল করা।
- ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাসের এলাকার ভূমি তাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভূমি বেদখল বিষয়ক অভিযোগ তদন্ত ও নিরসনের জন্য 'পার্বত্য চট্টগ্রামের' মতো একটি ভূমি কমিশন বা ট্রাইবুনাল তাদের জন্যও গঠন করতে হবে। কমিশন বা ট্রাইবুনাল এমন হবে যেখানে গ্রামীণ জনগণ সহজেই যেতে পারে, পদ্ধতি সহজ হবে, খরচ কম পড়বে এবং এর সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা থাকবে।
- অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর ভূমি যেন বেদখল না হয় তার জন্য যে আইনী ব্যবস্থা আছে তার যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা। ভূমি বেদখল বন্ধের জন্য প্রয়োজনে আরো কঠিন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা।
- বেদখল হওয়া এবং পরবর্তিতে খাস ঘোষণা করা জমি অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর ফেরত দেবার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর সাধারণ ও যৌথ ভূমি অধিকারে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেয়া।
- সরকারি বনাঞ্চলের মধ্যে যে ভূমিগুলি অন্ত্যজ জনগোষ্ঠী ঐতিহ্যগতভাবে ভোগ বা ব্যবহার করে আসছিলো তা আবার অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীকে ফেরত দেওয়া বা স্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করা।
- ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাসত্ত্ব আইনের ৯৭ ধারার মধ্যে পড়েনা এমন যেসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এলাকা রয়েছে সেইগুলোকেও এই আইনের আওতায় আনার ব্যবস্থা করা।

- ডেপুটি কমিশনার ও থানা নির্বাহী অফিসারের জন্য ভূমি বিষয়ক ক্ষুদ্র জাতিসত্তা পরামর্শক নিয়োগের ব্যবস্থা করা।
- ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভূমি বেদখল হওয়ার ব্যাপারে জেলা প্রশাসকের জন্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরামর্শ কমিটি গঠন করতে হবে।
- বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্টের ৯৭ ধারা সংশোধনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভূমি অন্যায়ভাবে হস্তান্তর প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে।

**বন, পাহাড় এবং জলাভূমির মতো প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অধিকার**

- পার্বত্য চট্টগ্রাম, মধুপুর, ঝিনাইগাতি ও বৃহত্তর সিলেট জেলা, সুন্দরবন বা অন্যান্য বনাঞ্চলে ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অধিকার নিশ্চিত করা। বনজ সম্পদ পাচার বন্ধে ব্যবস্থা করা।
- ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকারকে স্বীকৃতিসহ বন ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা; তাদের অধিকৃত ভূমির ম্যাপিং করা এবং রেজিস্ট্রিকরণের ব্যবস্থা করা।
- সামাজিক বনায়নের নামে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার উচ্ছেদ প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে।
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার অংশিদারীত্ব নিশ্চিত করা। বন আইনের প্রণয়নে ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় তাদের পরামর্শ গ্রহণ ও তা গুরুত্ব প্রদান করা।
- বনাঞ্চলের বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।
- সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কিছু অংশ বন বিভাগের আওতামুক্ত করে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বন্দোবস্তের বা লীজের ব্যবস্থা করা।
- বর্তমান আইন সংশোধন করা, যেন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে বন ব্যবস্থাপনা দায়িত্বে সম্পৃক্ত করা হয় এবং বন সম্পদ আহরণের আয়ের অংশ দেয়া হয়।
- সংরক্ষিত বা রক্ষিত বনাঞ্চলের বাইরে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে গ্রামীণ বনের আইনী স্বত্ত্ব দেয়া।
- ব্যক্তিগত বন থেকে কাঠ বা কাঠজাত দ্রব্য রপ্তানী বা প্রেরণ করা আইন আরো সহজতর করা।
- সংরক্ষিত বা রক্ষিত বনাঞ্চলের বাইরে গ্রামীণ বনের কাঠ সংগ্রহের জন্য আলাদা আইন প্রণয়ন করা।
- সরকারি বনাঞ্চলের মধ্যে যে ভূমিগুলো ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ঐতিহ্যগতভাবে ভোগ বা ব্যবহার করে আসছিলো তা আবার তাদের ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করা।

- বন আইনে এমনভাবে সংশোধন করা যাতে করে সরকারি বন ভূমির চারপাশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ঐ বন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক উত্থান ঘটাতে পারে।

**উন্নয়ন প্রকল্পে সম্পৃক্ততার অধিকার**

- ক্ষুদ্র জাতিসত্তার এলাকায় বহুজাতিক কোম্পানী বা দাতা সংস্থার কোন উন্নয়ন প্রকল্প নেয়ার আগে ঐ এলাকায় তার নেতিবাচক ও ইতিবাচক প্রভাব যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে এবং তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- যেকোন নতুন বন এবং পানি সম্পদ সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জীবনকে প্রভাবিত করে, এমন কোন প্রকল্প গ্রহণের আগে তাদের স্বাধীন মতামত ও সম্মতি গ্রহণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের অর্থপূর্ণ অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা। উন্নয়নের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ন্যাশনাল পার্ক, ইকো-পার্ক ইত্যাদি প্রকল্প ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সম্মতি ছাড়া তাদের ভূমিতে করা যাবেনা; যদি প্রকল্প নেয়া হয়, তবে তাদের অংশীদারিত্ব ও মালিকানা প্রদান করা।

# তথ্যপঞ্জি


- আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে, সংহতি ২০০১, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম।
- আমাদের ভূমি আমাদের জীবন, সংহতি ২০০৪, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম।
- আদিবাসী অঞ্চল, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আদিবাসীদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, সংহতি ২০০৬, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম।
- আদিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার, সংহতি ২০০৮, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম।
- আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও আত্ম-পরিচয়ের অধিকার, সংহতি ২০১০, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম।
- পারভেজ, আলতাফ ও বিশ্বাস, রমেন, আগস্ট ২০১০, বৈচিত্র ও সামাজিক বঞ্চনা: বংশ ও পেশাগত কারণে বৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠীর অবস্থান নির্ণয়, নাগরিক উদ্যোগ। - বারকাত, আবুল ও কে রায়, প্রশান্ত, আগস্ট ২০০৪, বাংলাদেশের ভূমি-মামলার রাজনৈতিক অর্থনীতি: বিশাল এক জাতীয় অপচয়ের কথকতা, পাঠক সমাবেশ। মুরমু, মিথুশিলাক, ফেব্রুয়ারি-২০০৯, আদিবাসী অন্বেষণ, নওরোজ কিতাবিস্তান।
- Abdul, Mohammed Baten; Khan, Niaz Ahmed, Ahammad, Ronju; and Missbahuzzaman, Khaled; ***Village Common Forests in Chittagong Hill Tracts, Bangladesh: Balance between Conservation and Exploitation, The innovators.*** The research paper was presented at First International Community Forestry Conference held in Nepal on 15-18 September 2009. Available at: *http://www.unnayan.org/reports/VCF1.pdf*
- Adhikari, Bhim, February 2001, ***Literature Review on the Economics of Common Property Resources: Review of Common Pool Resource Management in Tanzania. Available at: www.dfid.gov.uk***
- Bremner, Jason; Lu, Flora; December 2006, ***Common Property among Indigenous Peoples of the Ecuadorian Amazon,*** *Conservation and Society,* Volume 4, No. 4, Pages 499–521.
- Bromley, Daniel W., ***Testing for Common versus Private Property: Comment,*** 1991, Journal of Environmental Economics and Management 21. Pg-92-96.
- Bromley, Daniel.W, 1992, ***The Commons, Common Property, and Environmental Policy,*** Environmental and Resougce Economics 2: pg-1—17, Kluwer Acadenuc Publishers.
- Chakma, Bhuvaneswar, August 2004, ***Status of Indigenous Peoples in Bangladesh, Our land Our Life,*** Solidarity 2004, Bangladesh Indigenous Peoples Forum.
- Chowdhury, Iftekhar Uddin, 2009, ***Caste–based Discrimination in South Asia: A Study of Bangladesh,*** IIDS ( Indian Institute of Dalit Studies) Working Paper, Volume III, Number 07
- Finn, Seamus P., August 2008, ***Claims in Conflict in Land Rights,*** *Economic and Social Rights of Indigenous Peoples, Solidarity 2008*, Bangladesh Indigenous Peoples Forum.
- Gain, Philip,(ed), 1998, ***Bangladesh Land Forest and Forest People***, Society for Environment and Human Development.
- Guhathakurta, Meghna,(ed), November 2006, ***Including the Excluded, Rights of Minorities in South Asia***, South Asian People's Commission for the Rights of Minorities..
- Halim, Sadeka, August 2008, ***Making Adivasi Women Visible: Struggle and Challenges***, *Economic and Social Rights of Indigenous Peoples, Solidarity 2008,* Bangladesh Indigenous Peoples Forum.
- Halim, Sadeka & Barkat, Abul, August 2010, ***Adivasis of the Plains: Living on the Edge,*** *Right to Culture and Self-Identity of Indigenous Peoples, Solidarity 2010,* Bangladesh Indigenous Peoples Forum.

- ***Information on the Caste System,*** Bangladesh - Researched and compiled by the Refugee Documentation Centre of Ireland on 3 September 2010, Available at- *www.unhcr.org/refworld/pdfid/ 4b8fcb1d19.pdf*
- Iva, Irfat Ara, 13 Apr 2010, ***Status of Minorities in Bangladesh in 2009,*** Available at: *www.southasianrights.org/wp-content/uploads/ 2009/10/Bangladesh.pdf*
- James L. Wescoat Jr, 1990, ***Common Law, Common Property, and Common Enemy: Notes on the Political Geography of Water Resources Management For the Sundarbans Area of Bangladesh,*** *Agriculture and Human Values,* Volume 7, Number 2, pg-73-87, *Available at: http://www.springerlink.com/content/ r7377447 q862x637/*
- Lasimbang, Jannie, August 2004, ***National Parks: Indigenous Resource Management Principles in Protected Areas and Indigenous Peoples of Asia,*** *Our land Our Life, Solidarity 2004,* Bangladesh Indigenous Peoples Forum.
- Rashid, Saifur, September 2005, ***Common Property Rights and Indigenous Fishing Knowledge in the Inland Fisheries of Bangladesh: The Case of the Koibortta Fishing Community of Kishorgonj.*** Available at: *http://adt.curtin.edu.au/theses/ available/adt-WCU20051213.092754/ unrestricted/ 01Front.pdf*
- Reza, Shamsur Rahman,(ed), December 1996, ***Religio–Ethnic Minority Groups of Southwest Bangladesh,*** A Preliminary Survey Report, Bhumija.
- Roy, Raja Devasish, 2000, ***Occupations and Economy in Transition: A Case Study of the Chittagong Hill Tracts, Traditional Occupations of Indigenous and Tribal people- Emerging Trends,*** International Labor Organization.
- Roy,Raja Devasish; Mohsin, Amena; Gain, Philip,(ed), 2000, ***The Chittagong Hill Tracts: Life and Nature at Risk,*** Society for Environment and Human Development.
- Roy, Devasish, August 2001, ***Cultural Rights of Adivasi Peoples and the Indigenous Roots of Bengali Culture,*** *Constitutional Recognition for the Indigenous Peoples, Solidarity 2001,* Bangladesh Indigenous Peoples Forum.
- Schlager, Edella; Ostrom, Elinor; August 1992, ***Property-Rights Regimes and Natural Resources:A Conceptual Analysis,*** *Land Economics* , 68(3): 249-62
- ***The human rights situation of Dalits in Bangladesh: Their Socio-economic Problems, Legal and Constitutional Protections, and the Issues of Discrimination on the Basis of Caste and Lower Status, 2009,*** Joint NGO Submission by Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement, Nagorik Uddyog and the International Dalit Solidarity Network Related to Bangladesh for the 4th UPR session, February 2009, Available at – http:// www. idsn.org/uploads/media/UPR_Bangladesh.pdf
- Timm, Father R W, August 2004, ***Our Land, Our Life,*** *Our Land, Our Life, Solidarity 2004,* Bangladesh Indigenous Peoples Forum.
- Tripura, Borendra Lal, August 2008, ***The Constitution and Education Policy of Bangladesh and the Place of Minority Languages,*** *Economic and Social Rights of Indigenous Peoples, Solidarity 2008,* Bangladesh Indigenous Peoples Forum.
- Tripura, Abhilash, August 2010, ***ILO Standards on Indigenous Peoples and prospects in Bangladesh,*** *Right to Culture and self-identity of indigenous peoples, Solidarity 2010,* Bangladesh Indigenous Peoples Forum.
- Tutu, Ashraf-ul-Alam, ***Indigenous People in The South-West Coastal Region of Bangladesh.*** Available at-h*ttp://www.cdp. 20m.com/indigenousppl.html Report*

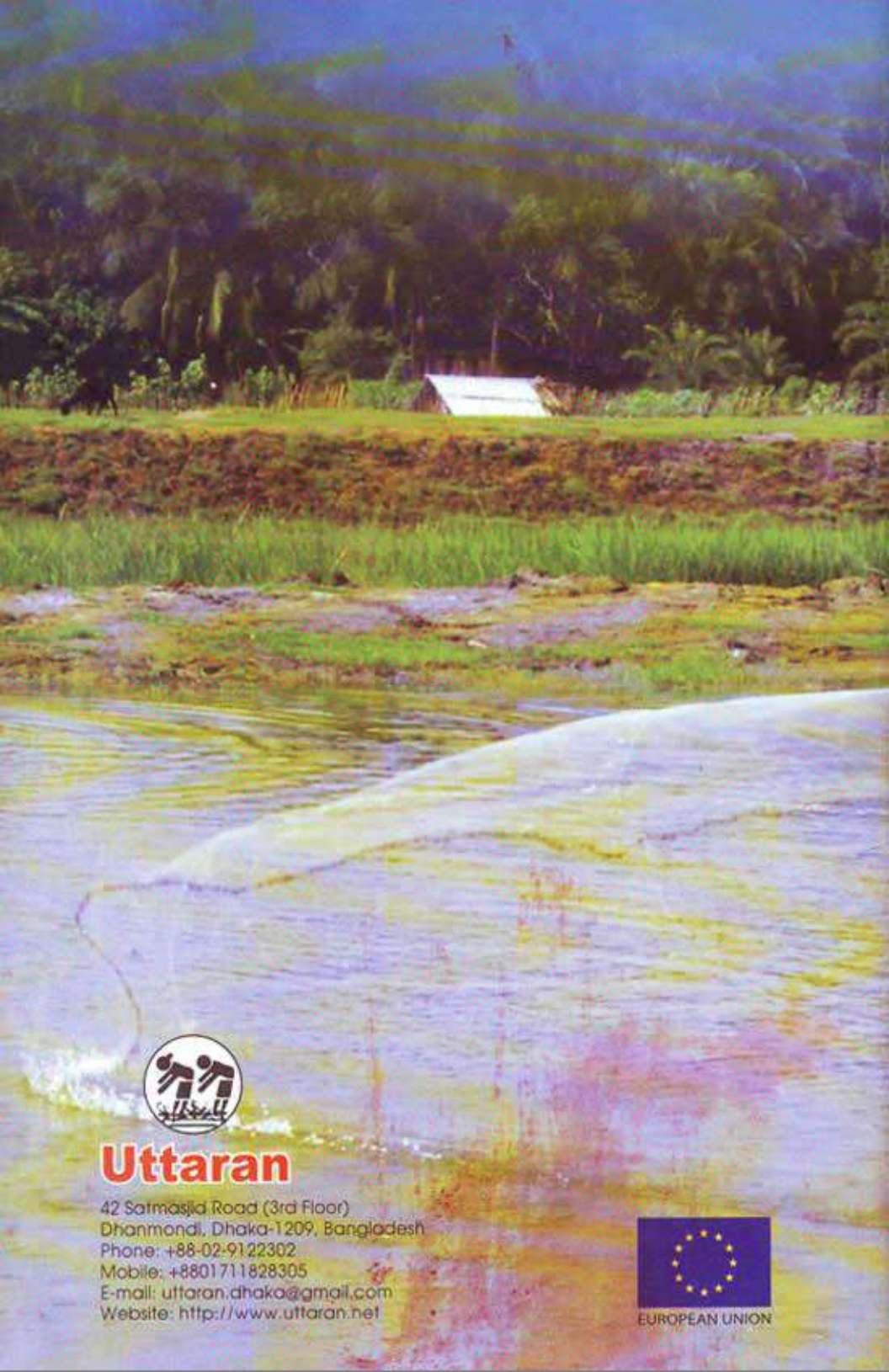


**Uttaran**

42 Satmasjid Road (3rd Floor)
Dhanmondi, Dhaka-1209, Bangladesh
Phone: +88-02-9122302
Mobile: +8801711828305
E-mail: uttaran.dhaka@gmail.com
Website: http://www.uttaran.net



EUROPEAN UNION